هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ

তাফহীমুল কুরআন

সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদূদী
রহ.

আল হাদীদ

৫৭

নামকরণ

সূরার ২৫ আয়াতের وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ বাক্যাংশ থেকে নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

সর্ব সম্মত মতে এটি মদীনায় অবতীর্ণ সূরা। এ সূরার বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে মনে হয় সম্ভবত উহুদ যুদ্ধ ও হুদায়বিয়ার সন্ধির মধ্যবর্তী কোন এক সময় এ সূরা নাযিল হয়েছে। এটা সে সময়ের কথা যখন কাফেররা চারদিক থেকে ক্ষুদ্র এ ইসলামী রাষ্ট্রটিকে তাদের আক্রমণের লক্ষস্থল বানিয়েছিল এবং ঈমানদারদের ক্ষুদ্র একটি দল অত্যন্ত সহায় সম্বলহীন অবস্থায় সমগ্র আরবের শক্তির মোকাবিলা করে যাচ্ছিলেন। এ পরিস্থিতিতে ইসলাম তার অনুসারীদের কাছে শুধু জীবনের কুরবানীই চাচ্ছিলো না বরং সম্পদের কুরবানীর প্রয়োজনীয়তাও একান্তভাবে উপলব্ধি করছিলো। এ ধরনের কুরবানী পেশ করার জন্য এ সূরায় অত্যন্ত জোরালো আবেদন জানানো হয়েছে। সূরার ১০ আয়াত এ অনুমানকে আরো জোরালো করছে। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের দলকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, যারা বিজয়ের পরে নিজেদের অর্থ সম্পদ খরচ করবে এবং আল্লাহর পথে লড়াই করবে তারা কখনো ঐ সব লোকের সমমর্যাদা সম্পন্ন হতে পারবে না যারা বিজয় লাভের পূর্বে জান ও মালের কুরবানী পেশ করবে। ইবনে মারদুইয়া কর্তৃক উদ্ধৃত হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীস একথাই সমর্থন করে। তিনি اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন ঃ কুরআন নাযিলের শুরু থেকে ১৭ বছর পর ঈমানদারদের আলোড়নকারী এ আয়াতটি নাযিল হয়। এ হিসেব অনুসারে এর নাযিল হওয়ার সময় ৪র্থ ও পঞ্চম হিজরী সনের মধ্যবর্তী সময়ই এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কাল বলে নির্ধারিত হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার উপদেশ দান। যখন আরব জাহেলিয়াতের সাথে ইসলামের সিদ্ধান্তকর সংগ্রাম চলছিলো, ইসলামের ইতিহাসের সে সংকটকালে মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে আর্থিক কুরবানীর জন্য প্রস্তুত করা এবং ঈমান যে শুধু মৌখিক স্বীকৃতি ও বাহ্যিক কিছু কাজকর্মের নাম নয় বরং আল্লাহ ও তার রসূলের জন্য একনিষ্ঠ হওয়াই তার মূল চেতনা ও প্রেরণা, একথা তাদের

www.icsbook.info

মনে বদ্ধমূল করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই এ সূরা নাযিল করা হয়েছিল। যে ব্যক্তির মধ্যে এ চেতনা ও প্রেরণা অনুপস্থিত এবং আল্লাহ ও তার দীনের মোবাবিলায় নিজের প্রাণ, সম্পদ ও স্বার্থকে অধিকতর ভালবাসে তার ঈমানের দাবী অন্তসার শূন্য। আল্লাহর কাছে এ ধরনের ঈমানের কোন মূল্য ও মর্যাদা নেই।

এ উদ্দেশ্যে সর্ব প্রথম আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে যাতে শ্রোতারা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারে যে, কোন মহান সত্তার পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বোধন করা হচ্ছে। তারপর নিম্নের বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে পেশ করা হয়েছে।

ঈমানের অনিবার্য দাবী হচ্ছে, ব্যক্তি যেন আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে গড়িমসি ও টালবাহানা না করে। এ ধরনের কাজ শুধু ঈমানের পরিপন্থীই নয়, বাস্তবতার বিচারেও ভুল। কেননা, এসব অর্থ-সম্পদ মূলত আল্লাহ তা'আলারই অর্থ-সম্পদ। তোমাদেরকে খলিফা হিসেবে তা ব্যবহার করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। এ অর্থ-সম্পদই কাল অন্যদের হাতে ছিল, আজ তোমাদের হাতে আছে এবং ভবিষ্যতে অন্য কারো হাতে চলে যাবে। শেষ মেশ তা বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিসের মালিক আল্লাহর কাছেই থেকে যাবে। এ সম্পদের কোন অংশ তোমাদের কাজে লাগলে কেবল সেই অংশই লাগতে পারে যা তোমাদের অধিকারে থাকা কালে তোমরা আল্লাহর কাজে ব্যয় করবে।

আল্লাহর পথে জান ও মালের কুরবানী পেশ করা যদিও সর্বাবস্থায়ই সম্মানজনক কাজ। কিন্তু এসব ত্যাগ ও কুরবানীর মূল্য ও মর্যাদা অবস্থার নাজুকতা দিয়ে নিরূপিত হয়। এমন সময়ও আসে যখন কুফরী শক্তি অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে এবং সর্বক্ষণ এমন একটা আশংকা বিদ্যমান থাকে যে, কুফরীর সাথে সংঘাতে ইসলাম হয়তো পরাভূত হয়ে পড়বে। আবার এমন একটা সময়ও আসে যখন কুফর ও ইসলামের দ্বন্দে শক্তির ভারসাম্য ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং ন্যায় ও সত্যের দুশমনদের মোকাবেলায় ঈমানের অনুসারীরা বিজয়লাভ করতে থাকে। গুরুত্বের দিক দিয়ে এ দু'টি পরিস্থিতি সমান নয়। তাই এ ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে যে ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করা হয় মূল্যের দিক দিয়ে তাও সমান নয়। ইসলাম যখন দুর্বল তখন তাকে সমুন্নত ও বিজয়ী করার জন্য যারা প্রাণপণ চেষ্টা সাধনা ও অর্থ সম্পদ ব্যয় করবে ইসলামের বিজয় যুগে তার বিস্তার ও প্রসারের জন্য যারা প্রাণ ও সম্পদ অকাতরে ব্যয় করবে তারা তাদের সমমর্যাদা লাভ করতে পারবে না।

ন্যায় ও সত্যের পথে যতটা সম্পদ ব্যয় করা হবে আল্লাহর কাছে তা ঋণ হিসেবে গণ্য হবে। আর আল্লাহ ঐ সম্পদকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দেবেন শুধু তাই নয় নিজের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত পুরস্কারও দান করবেন।

আখেরাতে সেসব ঈমানদার কেবল নূর লাভ করবে যারা আল্লাহর পথে তাদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছে। মুনাফিকরা যারা দুনিয়াতে নিজেদের স্বার্থই কেবল রক্ষা করেছে। এবং ন্যায় ও সত্য বিজয়ী হচ্ছে, না বাতিল বিজয়ী হচ্ছে তার কোন পরোয়াই করেনি। দুনিয়ার এ জীবনে তারা ঈমানদারদের সাথেই মিলে মিশে থাকলেও আখেরাতে

www.icsbook.info

তাদেরকে ঈমানদারদের থেকে আলাদা করে দেয়া হবে। তারা 'নূর' থেকে বঞ্চিত হবে এবং কাফেরদের সাথে তাদের হাশর হবে।

যেসব আহলে কিতাবের গোটা জীবন দুনিয়া পূজায় অতিবাহিত হয়েছে এবং যাদের মন দীর্ঘদিনের গাফলতি ও অমনোযোগিতার কারণে পাথরের ন্যায় কঠোর হয়ে গিয়েছে মুসলমানদের তাদের মত হয়ে যাওয়া ঠিক নয়। সে কেমন ঈমানদার আল্লাহর কথা শুনে যার হৃদয়মন বিগলিত হয় না। এবং তাঁর নাযিলকৃত সত্য বিধানের সামনে মাথা নত করে না।

কেবল সেই সব ঈমানদারই আল্লাহর নিকট 'সিদ্দীক' ও শহীদ বলে গণ্য যারা কোন রকম প্রদর্শনীর মনোভাব ছাড়াই একান্ত আন্তরিকতা ও সততার সাথে নিজেদের অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে।

দুনিয়ার জীবন মাত্র কয়েক দিনের চাকচিক্য এবং ধোকার উপকরণ। এখানকার খেল তামাসা, এখানকার আনন্দ ও আকর্ষণ, এখানকার সৌন্দর্য ও সাজ সজ্জা, এখানকার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে গর্ব ও অহংকার এবং এখানকার ধন সম্পদ ও ঐশ্বর্যের ব্যাপারে একে অপরকে অতিক্রম করার চেষ্টা সাধনা সব কিছুই অস্থায়ী। এর উপমা দেয়া যায় সেই শস্য ক্ষেত্রের সাথে যা প্রথম পর্যায়ে সবুজ ও সতেজ হয়ে ওঠে। তারপর বিবর্ণ হয়ে তামাটে বর্ণ ধারণ করে এবং সর্বশেষে ভূষিতে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে আখেরাতের জীবন হচ্ছে স্থায়ী জীবন যেখানে সব কাজের বড় বড় ফলাফল পাওয়া যাবে। তোমাদের যদি প্রতিযোগিতামূলকভাবে কিছু করতে হয় তাহলে জান্নাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার জন্য চেষ্টা করো। পৃথিবীতে আরাম-আয়েশ ও বিপদ আপদ যাই আসে তা আল্লাহ তা'আলার পূর্ব লিখিত সিদ্ধান্ত অনুসারেই আসে। একজন ঈমানদারের ভূমিকা হওয়া উচিত বিপদ আপদ আসলে সাহস না হারানো এবং আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তি আসলে গর্ব প্রকাশ না করা। একজন মুনাফিক বা কাফেরের আচরণ হচ্ছে আল্লাহ যদি তাকে নিয়ামত দান করেন তাহলে সে গর্বে মেতে ওঠে, অহংকার প্রকাশ করতে থাকে এবং নিয়ামত দাতা আল্লাহর কাজে ব্যয় করতে নিজেও সংকীর্ণতার পরিচয় দেয় এবং অন্যদেরকেও কার্পণ্য করতে পরামর্শ দেয়।

আল্লাহ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, কিতাব এবং ন্যায় বিচারের ভারসাম্যপূর্ণ মানদণ্ড সহকারে তাঁর রসূল পাঠিয়েছেন, যাতে মানুষ ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে আর তার সাথে লোহাও নাযিল করেছেন যাতে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠা এবং বাতিলের মাথা অবনত করার জন্য শক্তি ব্যবহার করা যায়। এভাবে আল্লাহ দেখতে চান মানুষের মধ্যে এমন লোক কারা যারা তাঁর দীনের সহায়তা ও সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হয় এবং সেজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। তোমাদের নিজেদের উন্নতি ও মর্যাদার জন্য আল্লাহ এই সুযোগসমূহ সৃষ্টি করেছেন। অন্যথায় আল্লাহ তাঁর কাজের জন্য কারো মুখাপেক্ষী নন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে ইতিপূর্বেও একের পর এক নবী রসূলগণ এসেছেন। তাদের আহবানে কিছু লোক সঠিক পথে ফিরে এসেছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই পাপাচারী রয়ে গিয়েছে। তার পর ঈসা আলাইহিস সালাম এসেছেন। তাঁর শিক্ষায় মানুষের মধ্যে বহু নৈতিক গুণাবলী সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তাঁর 'উম্মত' বৈরাগ্যবাদের বিদআত অবলম্বন করে।

www.icsbook.info

এখন আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন। যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করবে আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমতের দ্বিগুণ অংশ দেবেন এবং তাদেরকে এমন 'নূর' দান করবেন যার সাহায্যে তারা দুনিয়ার জীবনে পদে পদে বাঁকা পথসমূহের মধ্যে সোজা পথটি স্পষ্ট দেখে চলতে পারবে। আহলে কিতাব নিজেদেরকে যদিও আল্লাহর রহমতের ঠিকাদার মনে করে থাকে। কিন্তু আল্লাহর রহমত তাঁর নিজেরই হাতে আছে। যাকে ইচ্ছা তাকে এই রহমত ও অনুগ্রহ দান করার ইখতিয়ার তাঁর আছে। এ হচ্ছে এই সূরায় সুবিন্যস্ত ও ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সার সংক্ষেপ।

www.icsbook.info

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ
فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا
وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ
الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ۚ وَرَهْبَانِيَّةً ۟ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا
عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۖ فَآتَيْنَا
الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٧﴾

৪ রুকূ'

আমি[৪৮] নূহকে ও ইবরাহীমকে পাঠিয়েছিলাম এবং তাদের উভয়ের বংশধরের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাবের প্রচলন করেছিলাম[৪৯]। তারপর তাদের বংশধরদের কেউ কেউ হিদায়াত গ্রহণ করেছিল এবং অনেকেই ফাসেক হয়ে গিয়েছিল[৫০]। তাদের পর আমি একের পর এক আমার রসূলগণকে পাঠিয়েছি। তাদের সবার শেষে মারয়ামের পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি, তাকে ইনজীল দিয়েছি এবং তার অনুসারীদের মনে দয়া ও করুণার সৃষ্টি করেছি[৫১]। আর বৈরাগ্যবাদ তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করে নিয়েছে[৫২]। আমি ওটা তাদের ওপর চাপিয়ে দেইনি। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তারা নিজেরাই এ বিদয়াত বানিয়ে নিয়েছে[৫৩]। তারপর সেটি যেভাবে মেনে চলা দরকার, সেভাবে মেনেও চলেনি[৫৪]। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, তাদের প্রতিদান আমি দিয়েছি। তবে তাদের অধিকাংশই পাপী।

৪৮. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে যে রসূলগণ 'বাইয়েনাত' কিতাব ও মিযান নিয়ে এসেছিলেন তাদের অনুসারীদের মধ্যে কি বিকৃতি সৃষ্টি হয়েছিলো এখানে তাই বলা হচ্ছে।

৪৯. অর্থাৎ যে রসূলই কিতাব নিয়ে এসেছিলেন তারা হযরত নূহ (আ) ও তাঁর পরবর্তীগণ হযরত ইবরাহীমের বংশধর ছিলেন।

৫০. অর্থাৎ অবাধ্য হয়ে গিয়েছিলো এবং আল্লাহর আনুগত্যের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো।

৫১. মূল আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে رأفت ও رحمت। এ দু'টি শব্দ প্রায় সমার্থক কিন্তু দু'টি শব্দই যখন একসাথে বলা হয় তখন رأفت এর অর্থ হয় মনের নম্র ও সদয়

www.icsbook.info

অনুভূতি যা কাউকে দুঃখ কষ্ট ও বিপদের মধ্যে দেখে কারো মনে সৃষ্টি হয়। আর رحمت অর্থ সেই আবেগ যার কারণে সে তাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যেহেতু অত্যন্ত দয়াদ্র হৃদয় এবং আল্লাহর সৃষ্টির জন্য অত্যন্ত দয়ালু ও স্নেহ প্রবন ছিলেন। তাই তাঁর অনুসারীদের মধ্যেও তাঁর চরিত্রের এ প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিলো। যার কারণে আল্লাহর বান্দাদের জন্য তাদের মনে দয়া সৃষ্টি হতো এবং সহানুভূতির সাথে তাদের সেবা করতো।

৫২. এ শব্দটির উচ্চারণ 'রাহবানিয়াত' ও 'রুহ্‌বানিয়াত' দুই রকমই করা হয়ে থাকে। এর শব্দমূল رهب যার অর্থ হচ্ছে ভয়। রাহবানিয়াত অর্থ ভীত হওয়ার পথ ও পন্থা এবং রুহ্‌বানিয়াত অর্থ ভীতদের পথ ও পন্থা। এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে ভয়ের কারণে কোন ব্যক্তির (কারো জুলুম নির্যাতনের ভয়ে হোক বা দুনিয়ার ফিতনার ভয়ে হোক কিংবা নিজের প্রবৃত্তির দুর্বলতার ভয়ে হোক) দুনিয়াত্যাগী হয়ে যাওয়া এবং দুনিয়ার জীবন থেকে পালিয়ে বন-জংগলে বা পাহাড়ে আশ্রয় নেয়া কিংবা নির্জন নিভৃতে যেয়ে বসা।

৫৩. মূল আয়াতে ব্যবহৃত বাক্যাংশ হচ্ছে اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ । এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে আমি তাদের জন্য রাহ্‌বানিয়াত বা বৈরাগ্যবাদ ফরয করেছিলাম না। বরং আমি তাদের ওপর যা ফরয করেছিলাম তা ছিলো এই যে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করবে। আর অপর অর্থটি হচ্ছে, এ বৈরাগ্যবাদ আমার ফরযকৃত ছিল না। বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে তারা তা নিজেরাই নিজেদের ওপর ফরয করে নিয়েছিলো। দু'টি অবস্থাতেই এ আয়াতটি একথা স্পষ্ট করে তুলে ধরছে যে, বৈরাগ্যবাদ একটি অনৈসলামিক রীতি। এটি কখনো দীনে ইসলামের অংগীভূত ছিল না। এ প্রসংগেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, لَا رَهْبَانِيَّةَ فِى الْاِسْلَامِ "ইসলামে কোন বৈরাগ্যবাদ নেই" (মুসনাদে আহমদ)। অন্য একটি হাদীসে নবী (সা) বলেছেন ঃ رَهْبَانِيَّةُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ "আল্লাহর পথে জিহাদই হচ্ছে এ উম্মতের বৈরাগ্যবাদ।" (মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আবু ইয়া'লা) অর্থাৎ দুনিয়া বর্জন করা এ উম্মতের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ নয়, বরং এর আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ। আর এ উম্মত ফিতনার ভয়ে ভীত হয়ে বন-জংগল ও পাহাড়-পর্বতে পালিয়ে যায় না বরং আল্লাহর পথে জিহাদের মাধ্যমে তার মোকাবিলা করে। বুখারী ও মুসলিম উভয়ের বর্ণিত হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে যে, সাহাবীদের একজন বললেন ঃ আমি সব সময় সারা রাত নামায পড়বো। দ্বিতীয়জন বললো ঃ আমি সব সময় রোযা রাখবো, কখনো বিরতি দেব না। তৃতীয় জন বললো, আমি কখনো বিয়ে করবো না এবং নারীর সাথে কোন সম্পর্ক রাখবো না। তাদের এসব কথা শুনতে পেয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

اما والله انى لاخشاكم لله واتقاكم له لكنى اصوم وافطر واصلى

و ارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى -

"আল্লাহর শপথ, আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশী ভয় করি এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলি। আমার নীতি হলো, আমি রোযা রাখি এবং রোযা না রেখেও

www.icsbook.info

থাকি, রাতের বেলা নামাযও পড়ি আবার নিদ্রাও যাই এবং নারীদের বিয়েও করি। যে আমার নীতি পছন্দ করে না তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

হযরত আনাস বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ

لاَ تُشَدِّدُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ فَيُشَدِّدُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوْا فَشَدَّدَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَايَا هُمْ فِى الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ –

"নিজের প্রতি কঠোর হয়ো না তাহলে আল্লাহও তোমাদের প্রতি কঠোর হবেন। একটি কওম কঠোরতা অবলম্বন করলে আল্লাহও তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন। দেখে নাও, তারা এবং তাদের অবশিষ্টরা গীর্জা ও উপাসনালয়ে বর্তমান।"

(আবু দাউদ)।

৫৪. অর্থাৎ তারা দ্বিবিধ ভ্রান্তিতে ডুবে আছে। একটি ভ্রান্তি হচ্ছে তারা নিজেদের ওপর এমন সব বাধ্য বাধকতা আরোপ করে নিয়েছিল যা করতে আল্লাহ কোন নির্দেশ দেননি। দ্বিতীয় ভ্রান্তি হচ্ছে নিজেদের ধারণা মতে যেসব বাধ্য বাধকতাকে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উপায় বলে মনে করে নিজেদের ওপর আরোপ করে নিয়েছিলো তার হক আদায় করেনি এবং এমন সব আচরণ করেছে যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে তার গযব খরিদ করে নিয়েছে।

এ বিষয়টিকে ভালভাবে বুঝতে হলে খৃষ্টীয় বৈরাগ্যবাদের ইতিহাসের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করে নেয়া দরকার।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পর খৃষ্টান গীর্জাসমূহ দুই'শ বছর পর্যন্ত বৈরাগ্যবাদের সাথে অপরিচিত ছিল। কিন্তু শুরু থেকেই খৃষ্টান ধর্মে এর বিষাক্ত জীবাণু বিদ্যমান ছিল এবং যেসব ধ্যান–ধারণা এর জন্ম দেয় তাও এর মধ্যে বর্তমান ছিল। সংসার বর্জন ও নিসঙ্গ জীবন যাপনকে নৈতিক আদর্শ মনে করা এবং বিয়ে শাদী ও পার্থিব কায় কারবারমূলক জীবনের তুলনায় দরবেশী জীবন ধারাকে অধিক উন্নত ও ভাল মনে করাই বৈরাগ্যবাদের ভিত্তি। খৃষ্টান ধর্মে এ দু'টি জিনিস শুরু থেকেই ছিল। বিশেষ করে কৌমার্য বা নিসঙ্গ জীবন যাপনকে পবিত্রতার সম পর্যায়ের মনে করার কারণে গীর্জায় ধর্মীয় কাজ কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তিদের জন্য বিয়ে করা, তাদের সন্তানাদি থাকা এবং সাংসারিক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়াকে অপছন্দনীয় মনে করা হতো। তৃতীয় শতাব্দীর আগমনের পূর্বেই এটি একটি ফিতনার রূপ ধারণ করে এবং বৈরাগ্যবাদ মহামারীর আকারে খৃষ্ট ধর্মের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ঐতিহাসিকভাবে এর তিনটি বড় কারণ ছিল।

একটি কারণ হচ্ছে, প্রাচীন মুশরিক সমাজে যৌনতা, চরিত্রহীনতা ও দুনিয়া পূজা যে চরম আকারে বিস্তার লাভ করেছিল তা উচ্ছেদ করার জন্য খৃষ্টান পাদ্রীরা মধ্যপন্থা অবলম্বনের পরিবর্তে চরম পন্থার নীতি গ্রহণ করে। তারা সতীত্ব ও পবিত্রতার ওপর এমন গুরুত্ব আরোপ করে যে, বিয়ের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক হলেও তা মূলত অপবিত্র বলে গণ্য হয়। তারা দুনিয়া পূজার বিরুদ্ধে এমন কঠোরতা অবলম্বন করে যে, একজন দীনদার ও ধর্মভীরু লোকের পক্ষে কোন প্রকার সম্পদের মালিক হওয়া গোনাহর

www.icsbook.info

কাজ বলে গণ্য হয় এবং একেবারে নিসম্বল ও সব দিক দিয়ে দুনিয়াত্যাগী হওয়াটাই ব্যক্তির জন্য নৈতিক মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপ মুশরিক সমাজের ভোগবাদী নীতির প্রতিবাদে তারা এমন চরম পন্থার আশ্রয় নেয় যে, ভোগ সুখ বর্জন, যৌন বাসনাকে হত্যা করা এবং প্রবৃত্তির মূলোৎপাটন করাই নৈতিকতার উদ্দেশ্য হয়ে যায় এবং নানা রকম সাধনা দ্বারা শরীরকে কষ্ট দেয়াই ব্যক্তির আধ্যাত্মিক পূর্ণতা ও তার প্রমাণ হিসেবে মনে করা হতে থাকে।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, খৃষ্ট ধর্ম যখন সফলতার যুগে প্রবেশ করে এবং জনগণের মধ্যে বিস্তার লাভ করতে থাকে, গীর্জা তখন তার ধর্মের প্রসার ও প্রচারের আকাংখায় জনপ্রিয় প্রতিটি খারাপ জিনিসকেও তার গণ্ডিভুক্ত করতে থাকে। ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের পূজা প্রাচীন উপাস্যদের স্থান দখল করে নেয়। হোরাস (HORUS) ও আইসিস (ISIS) এর মূর্তির বদলে যীশু ও মারয়ামের মূর্তির পূজা শুরু হয়। স্যাটারনেলিয়া (Saturnalia) এর পরিবর্তে বড় দিনের উৎসব পালন শুরু হয়। খৃষ্টান দরবেশগণ প্রাচীন যুগের তাবিজ ও বালা পরা, আমল-তদবীর করা, শুভ-অশুভ লক্ষণ নির্ণয় ও অদৃশ্য বলা, জিন ভূত তাড়ানোর আমল সব কিছুই করতে শুরু করে। অনুরূপ যে ব্যক্তি নোংরা, অপরিষ্কার ও উলঙ্গ থাকতো এবং কোন কুঠরি বা গুহায় বসবাস করতো জনগণ যেহেতু তাকে ধার্মিক মনে করতো তাই খৃষ্টান গীর্জাসমূহ এটাই আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বা ওলী হওয়ার একমাত্র পথ বলে ধরে নেয়া হয়। এ ধরনের লোকদের 'কারামত' বা অলৌকিক ক্রিয়া কাণ্ডের কাহিনী দ্বারা খৃষ্টানদের মধ্যে তাযকিরাতুল আওলিয়া ধরনের প্রচুর বই-পুস্তক বহুল প্রচারিত হয়।

তৃতীয় কারণ হচ্ছে ধর্মের সীমা নির্ণয়ের জন্য খৃষ্টানদের কাছে কোন বিস্তারিত শরীয়াত এবং কোন সুস্পষ্ট 'সুন্নাত' বর্তমান ছিল না। মূসার শরীয়াতকে তারা পরিত্যাগ করেছিল, কিন্তু এককভাবে শুধু ইনজীলের মধ্যে কোন পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনামা ছিল না। এ কারণে খৃষ্টান পণ্ডিতগণ কিছুটা বাইরের দর্শন ও রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এবং কিছুটা নিজেদের মানসিক প্রবণতার কারণে ধর্মের মধ্যে নানা ধরনের বিদআতকে অন্তরভুক্ত করতে থাকে। বৈরাগ্যবাদ ওই সব বিদআতেরই একটি। খৃষ্টান ধর্মের পণ্ডিত পুরোহিত ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এ ধর্মের দর্শন ও এর কর্মপদ্ধতি বৌদ্ধ ধর্মের ভিক্ষু, হিন্দু যোগী-সন্নাসী, প্রাচীন মিসরীয় সংসার ত্যাগী (Anchorits) সন্নাসী, পারস্যের মানেবীয়া এবং প্লেটো ও প্লেটোনিক দর্শনের অনুসারীদের থেকে গ্রহণ করেছে এবং একেই আত্মার পরিশুদ্ধির পন্থা, আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় ও আল্লাহর নৈকট্যলাভের অসীলা হিসেবে গণ্য করেছে। যারা এ ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়েছিল তারা কোন সাধারণ লোক ছিল না। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী (অর্থাৎ কুরআন নাযিল হওয়ার সময়) পর্যন্ত তারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে খৃষ্ট ধর্মের বড় বড় পণ্ডিত-পুরোহিত এবং ধর্মীয় নেতা ও পথ প্রদর্শক ছিল। অর্থাৎ সেন্ট আথানাসিউয়াস, সেন্ট বাসেল, সেন্ট গ্রেগরী নাযিয়ানযীন, সেন্ট কারাই সুষ্টাম, সেন্ট আয়ম ব্রোজ, সেন্ট জিরুম, সেন্ট অগাষ্টাইন, সেন্ট বেনডিক্ট, মহান গ্রেগরী। এঁরা সবাই ছিলেন সংসার বিরাগী দরবেশ এবং বৈরাগ্যবাদের বড় প্রবক্তা। এদের প্রচেষ্টায়ই গীর্জাসমূহে বৈরাগ্যবাদ চালু হয়।

www.icsbook.info

ইতিহাস থেকে জানা যায়, খৃষ্টানদের মধ্যে বৈরাগ্যবাদের সূচনা হয় মিসর থেকে। সেন্ট এন্থনী (St. Anthony) ছিলেন এর প্রবর্তক। তিনি ২৫০ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৩৫০ খৃষ্টাব্দে মারা যান। তাঁকেই সর্ব প্রথম খৃষ্টান দরবেশ বলে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি 'কাইয়ুম' অঞ্চলে 'পাসপীর' নামক স্থানে (যা বর্তমানে দাইর আল-মাইমুন নামে পরিচিত) প্রথম খানকাহ প্রতিষ্ঠিত করেন। এরপর তিনি লোহিত সাগরের তীরে দ্বিতীয় খানকাহ প্রতিষ্ঠিত করেন, যাকে বর্তমানে দাইর মার আনতিনিউস বলা হয়। খৃষ্টানদের মধ্যে বৈরাগ্যবাদের মৌলিক নিয়ম-কানুন তাঁর লেখা ও নির্দেশাবলী থেকেই গৃহীত হয়েছে। এভাবে সূচনা হওয়ার পর গোটা মিসরে তা প্লাবনের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থানে স্থানে পুরুষ ও মহিলা দরবেশ ও সংসার বিরাগীদের জন্য স্বতন্ত্র খানকাহ গড়ে ওঠে যার কোন কোনটিতে তিন হাজার পর্যন্ত দরবেশ ও সন্ন্যাসী থাকতো। ৩২৫ খৃষ্টাব্দে মিসরেই পাখোমিউস নামের আরো একজন খৃষ্টান অলীর আবির্ভাব ঘটে, যিনি নারী ও পুরুষ সন্ন্যাসী-দরবেশদের জন্য দশটি বড় খানকাহ নির্মাণ করেন। এরপর এ ধারা সিরিয়া, ফিলিস্তিন এবং আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করতে থাকে। গীর্জা কর্তৃপক্ষ প্রথম প্রথম এ বৈরাগ্যবাদের ব্যাপারে কঠিন দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যায়। কারণ গীর্জাসমূহ দুনিয়া বর্জন, নিসঙ্গ ও কুমার জীবন যাপন এবং দারিদ্র ও অভাব অনটনকে আধ্যাত্মিক জীবনের আদর্শ মনে করতো ঠিকই কিন্তু সন্ন্যাসীদের বিয়ে শাদী করা, সন্তান উৎপাদন করা এবং সম্পদের মালিকানা লাভকে গোনাহর কাজ বলে আখ্যায়িত করতে পারতো না। অবশেষে সেন্ট আথানাসিউস (মৃত্যু ৩৭৩ খৃষ্টাব্দ), সেন্ট বাসেল (মৃত্যু ৩৭৯ খৃষ্টাব্দ), সেন্ট অগাষ্টাইন (মৃত্যু ৪৩০ খৃষ্টাব্দ) এবং মহান গ্রেগরী (মৃত্যু ৬০৯ খৃষ্টাব্দ) এর মত ব্যক্তিদের প্রভাবে বৈরাগ্যবাদের অনেক নিয়ম-কানুন চার্চ ব্যবস্থায় যথারীতি প্রবেশ লাভ করে।

এই বৈরাগ্যবাদী বিদআতের কতিপয় বৈশিষ্ট ছিল। আমরা সংক্ষেপে সেগুলো বর্ণনা করছি ঃ

এক ঃ কঠোর সাধনা ও নিত্য নতুন পন্থায় নিজের দেহকে নানা রকম কষ্ট দেয়া। এ ব্যাপারে প্রত্যেক দরবেশই অন্যদের পেছনে ফেলার চেষ্টা করতো। খৃষ্টান আওলিয়া দরবেশদের কিস্সা-কাহিনীতে তাদের কামালিয়াতের যেসব বর্ণনা আছে তা কতকটা এখানে বর্ণনা করা হলো ঃ

আলেকজান্দ্রিয়ার সেন্ট মাকারিউস তার দেহের ওপর সব সময় ৮০ পাউণ্ড ওজনের বোঝা বহন করতো। ৬ মাস পর্যন্ত সে কর্দমাক্ত মাটিতে শয়ন করতে থাকে এবং বিষাক্ত মক্ষিকাসমূহ তার উদোম শরীরে দংশন করতে থাকে। তার সাগরেদ সেন্ট ইউসিবিউস গুরুর চেয়েও অধিক সাধনায় মগ্ন হয়। সে সব সময় ১৫০ পাউণ্ড ওজনের বোঝা বহন করতো এবং তিনবছর পর্যন্ত একটি শুষ্ক কূপের মধ্যে অবস্থান করেছিলো। সেন্ট সাবিউস শুধু এমন জোয়ারের রুটি খেতেন যা গোটা মাস পানিতে ভিজে থাকার কারণে গন্ধযুক্ত হয়ে যেতো। সেন্ট বাইসারিউন ৪০ দিন পর্যন্ত কন্টকাকীর্ণ ঝোপের মধ্যে পড়েছিলো এবং ৪০ বছর পর্যন্ত সে মাটিতে পিঠ ঠেকায়নি। সেন্ট পাখোমিউস ১৫ বছর অপর একটি বর্ণনা অনুসারে পঞ্চাশ বছর মাটিতে পিঠ না ঠেকিয়ে অতিবাহিত করেছে। সেন্ট জন নামক একজন ওলী তিন বছর পর্যন্ত উপাসনারত অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল। পুরো এই সময়টাতে সে

www.icsbook.info

কখনো বসেও নাই কিংবা শয্যা গ্রহণও করে নাই। আরাম করার জন্য একটি বড় পাথরে হেলান দিত এবং প্রতি রবিবারে তার জন্য 'তাবাররুক' হিসেবে যে খাদ্য আনা হতো কেবল তাই ছিল তার খাদ্য। সেন্ট সিমিউন স্টায়লাইট (৩৯০–৪৪৯ খৃঃ) খৃষ্টানদের বড় বড় ওলী দরবেশদের অন্যতম। প্রত্যেক ইষ্টারের আগে সে পুরা চল্লিশ দিন না খেয়ে কাটিয়ে দিত। একবার সে পুরো এক বছর পর্যন্ত এক পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। মাঝে মধ্যে সে তার খানকাহ থেকে বেরিয়ে একটি কূপের মধ্যে গিয়ে থাকতো। অবশেষে সে উত্তর সিরিয়ার সীমান দূর্গের সন্নিকটে ৬০ ফুট উঁচু একটি স্তম্ভ নির্মাণ করিয়ে নেয় যার ওপরের অংশের পরিধি ছিল মাত্র তিন ফুট। এরই উপরে তার জন্য একটি ঘেরা নির্মাণ করে দেয়া হয়েছিলো। এই স্তম্ভটির ওপরে সে পুরো তিনটি বছর কাটিয়ে দেয়। রোদ–বৃষ্টি ও শীত–গ্রীষ্ম সব কিছুই তার ওপর দিয়ে চলে যেতো কিন্তু স্তম্ভ থেকে সে কখনো নিচে নামতো না। তার শিষ্য সিড়ি লাগিয়ে তাকে খাবার পৌছাতো এবং তার ময়লা আবর্জনা সাফ করতো। তার পর সে একটি রশি দিয়ে নিজেকে স্তম্ভের সাথে বেঁধে নেয়। এমনকি রশি তার শরীরের মাংসের মধ্যে ঢুকে যায়। এতে মাংসে পচন ধরে এবং তাতে পোকা পড়ে। তার ফোঁড়া থেকে যখনই কোন পোকা নীচে পড়ে যেতো তখনই সে তা উঠিয়ে ফোঁড়ার মধ্যে রাখতো এবং বলতো ঃ "আল্লাহ তোকে যা খেতে দিয়েছেন, খা।" সাধারণ খৃষ্টানরা বহুদূর দূরান্ত থেকে তার সাক্ষাত লাভের জন্য আসতো। সে মারা গেলে খৃষ্টান জনতা তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেয় যে, সে খৃষ্টান অলী দরবেশদের মধ্যে সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত।

এ যুগের খৃষ্টান আওলিয়াদের যেসব গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে তা এ ধরনের দৃষ্টান্তে ভরা। অলীদের মধ্যে কারো পরিচয় ছিল এই যে, সে ৩০ বছর পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিশ্চুপ ছিল, তাকে কখনো কথা বলতে দেখা যায়নি। কেউ নিজেকে একটি বড় পাথরের সাথে বেঁধে রেখেছিল। কেউ জংগলে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতো এবং ঘাস ও লতাপাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতো। কেউ সব সময় ভারী বোঝা বহন করে বেড়াতো। কেউ শৃঙ্খলে নিজের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ বেঁধে রাখতো। কিছু সংখ্যক অলী আবার জীব–জন্তুর গুহায়, শুষ্ক বিরান কূপে কিংবা পুরনো কবরে গিয়ে বাস করতো। আরো কিছু সংখ্যক বুযর্গ সব সময় উলঙ্গ থাকতো, লম্বা চুল দিয়ে নিজেদের লজ্জাস্থান ঢাকতো এবং বুকে হেঁটে চলতো। সবখানে এ ধরনের ওলী দরবেশদের কারামতের চর্চা হতো এবং মৃত্যুর পর তাদের হাড্ডিসমূহ খানকাহসমূহে সংরক্ষণ করা হতো। আমি নিজে সিনাই পর্বতের পাদদেশে সেন্ট ক্যাথারাইনের খানকায় এ ধরনের হাড় গোড়ে সজ্জিত গোটা একটা লাইব্রেরী দেখেছি যেখানে এক জায়গায় ওলীদের মাথার খুলি, এক জায়গায় পায়ের হাড় এবং এক জায়গায় হাতের হাড় সাজানো ছিল। একজন ওলীর গোটা কংকালই কাঁচের আলমারীতে রাখা ছিল।

দুই ঃ তাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট ছিল এই যে, তারা সব সময় নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন থাকতো এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে চরমভাবে বর্জন করে চলতো। তাদের দৃষ্টিতে গোসল করা বা শরীরে পানি লাগানো আল্লাহ ভীরুতার পরিপন্থী। দেহের পরিচ্ছন্নতাকে তারা আত্মার অপবিত্রতা বলে মনে করতো। সেন্ট আথানাসিউস অত্যন্ত ভক্তির সাথে সেন্ট এ্যানথোনীর এই বৈশিষ্টটি বর্ণনা করেছেন যে, মৃত্যু পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে তার নিজের পা

www.icsbook.info

৫০ বছর পর্যন্ত সে মুখ বা পা কিছুই ধোয়নি। এক বিখ্যাত খৃষ্টান সন্ন্যাসীনী কুমারী সিলভিয়া আঙ্গুল ছাড়া জীবনভর দেহের অন্য কোন অংশে পানি লাগতে দেয়নি। একটি কনভেন্টের ১৩০ জন সন্ন্যাষিনীর প্রশংসায় লেখা হয়েছে যে, তারা কখনো নিজেদের পা ধোয়নি। আর গোসলের তো নাম শুনলেই তাদের দেহে কম্পন সৃষ্টি হতো।

তিন ঃ এ বৈরাগ্যবাদ দাম্পত্য জীবনকে কার্যত পুরোপুরি হারাম করে দেয় এবং বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলার ব্যাপারে অত্যন্ত নির্মমভাবে কাজ করে। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর সমস্ত ধর্মীয় রচনাবলী এ ধারণায় ভরা যে, নিসঙ্গ জীবন বা কৌমার্য সর্বাপেক্ষা বড় নৈতিক মূল্যবোধ। পবিত্রতার অর্থ হচ্ছে ব্যক্তি যৌন সম্পর্ককে একেবারেই বর্জন করবে। এমনকি তা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার যৌন সম্পর্ক হলেও। এমন একটি অবস্থাকে পুতঃ পবিত্র আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণতা মনে করা হতো, যে ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তিকে পুরোপুরি হত্যা করে এবং তার মধ্যে দৈহিক ভোগাকাংখার লেশ মাত্রও অবশিষ্ট না থাকে। প্রবৃত্তিকে হত্যা করা তাদের দৃষ্টিতে এজন্য জরুরী ছিল যে, তা দ্বারা পশুত্ব শক্তি লাভ করে। তাদের কাছে ভোগ এবং গোনাহ ছিল সমার্থক। এমনকি তাদের দৃষ্টিতে আনন্দ প্রকাশ করাও আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার নামান্তর ছিল। সেন্ট বাসেল শব্দ করে হাসা এমনকি মুচকি হাসা পর্যন্ত নিষেধ করেছেন। এসব ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে তাদের কাছে নারী ও পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক একেবারেই অপবিত্র বলে গণ্য হয়েছিলো। বিয়ে তো দূরের কথা নারীর চেহারা না দেখা এবং বিবাহিত হলে স্ত্রীকে ফেলে চলে যাওয়া সন্ন্যাসীর জন্য অত্যন্ত জরুরী ছিল। পুরুষদের মত নারীদের মনেও একথা বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছিল যে, তারা যদি আসমানী বাদশাহীতে প্রবেশ করতে চায় তাহলে যেন চির কুমারী থাকে এবং বিবাহিতা হলে স্বামীদের থেকে আলাদা হয়ে যায়। সেন্ট জিরুমের মত বিশিষ্ট খৃষ্টান পণ্ডিত বলেন, যে নারী যীশু খৃষ্টের কারণে সন্ন্যাসিনী হয়ে সারা জীবন কুমারী থাকবে সে খৃষ্টের সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী আর সেই নারীর মা, খোদা অর্থাৎ খৃষ্টের শ্বাশুড়ী (Mother in law of god) হওয়ার মর্যাদা লাভ করবে। সেন্ট জিরুম অন্য একস্থানে বলেন ঃ "পবিত্রতার কুঠার দিয়ে দাম্পত্য বন্ধনের কাষ্ঠ খণ্ড কেটে ফেলাই আধ্যাত্মিক পথের অনুসারীর সর্ব প্রথম কাজ।" এসব শিক্ষার প্রভাবে ধর্মীয় আবেগ সৃষ্টি হওয়ার পর একজন খৃষ্টান পুরুষ বা খৃষ্টান নারীর মধ্যে এর সর্ব প্রথম যে প্রতিক্রিয়া হয় তা হচ্ছে, তার মধুর দাম্পত্য জীবন চিরদিনের জন্য ধ্বংস হয়ে যায়। আর খৃষ্টান ধর্মে যেহেতু তালাক ও বিচ্ছেদের কোন ব্যবস্থা ছিল না তাই বৈবাহিক বন্ধনের মধ্যে থেকেই স্বামী-স্ত্রী পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। সেন্ট নাইলাস (St. Nilus) ছিল দুই সন্তানের পিতা। সে বৈরাগ্যবাদের খপ্পরে পড়লে তার স্ত্রী কাঁদতে শুরু করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সেন্ট আম্মুন (St. Ammon) বিয়ের রাতে বাসর শয্যায়ই তার নব বধুকে দাম্পত্য সম্পর্কের অপবিত্রতা সম্পর্কে উপদেশ দেয় এবং উভয়ে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা আজীবন পরস্পর আলাদা থাকবে। সেন্ট এ্যালেক্সিসও (St. Alexis) এই একই কাজ করেছিল। খৃষ্টান আওলিয়া-দরবেশদের জীবন-কথা এ ধরনের কাহিনীতে ভরপুর।

গীর্জা কর্তৃপক্ষ তার গণ্ডির মধ্যে তিনশত বছর পর্যন্ত কোন না কোনভাবে এ চরমপন্থী ধ্যান-ধারণা প্রতিরোধ করতে থাকে। সেই সময় একজন পাদ্রীর জন্য নিসঙ্গ বা অবিবাহিত

www.icsbook.info

হওয়া জরুরী ছিল না। সে যদি পাদ্রীর পদ মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার আগেই বিবাহিত হয়ে থাকে তাহলে সে স্ত্রীর সাথেই থাকতে পারতো। তবে পাদ্রী হিসেবে নিয়োজিত হওয়ার পর তার বিয়ে করা নিষেধ ছিল। তাছাড়া এমন কোন ব্যক্তিকে পাদ্রী নিয়োগ করা যেতো না যে কোন বিধবা কিংবা তালাক প্রাপ্তাকে বিয়ে করেছে বা যার দুই স্ত্রী আছে কিংবা যার ঘরে দাসী আছে। ক্রমান্বয়ে চতুর্থ শতাব্দীতে এ ধারণা জোরদার হয়ে ওঠে যে, যে ব্যক্তি গীর্জায় ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করে তার বিবাহিত হওয়া অত্যন্ত ঘৃণার ব্যাপার। ৩৬২ খৃষ্টাব্দের গেংরা কাউন্সিল ছিল এ ব্যাপারে সর্বশেষ সম্মেলন যেখানে এ ধরনের ধ্যান-ধারণাকে ধর্মের পরিপন্থী বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু এর অল্প কিছুকাল পরেই ৩৮৬ খৃষ্টাব্দে রোমান সিনোড (Synod) সমস্ত পাদ্রীকে পরামর্শ দেয় যে, তারা যেন বৈবাহিক বন্ধন থেকে দূরে থাকে। পরের বছর পোপ সাইরিকিয়াস (Siricius) নির্দেশ জারি করে যে, যে পাদ্রী বিয়ে করবে কিংবা পূর্ব বিবাহিত হওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক রাখবে, তাকে তার পদ থেকে অপসারিত করা হোক। সেন্ট জিরুম, সেন্ট এ্যাম্ব্রুজ ও সেন্ট অগাষ্টাইনের মত বড় বড় পণ্ডিত ও মনীষী অত্যন্ত জোরালোভাবে এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে এবং যৎ সামান্য প্রতিরোধের পর পাশ্চাত্য গীর্জাসমূহে অত্যন্ত কঠোরভাবে তা চালু হয়। পূর্ব বিবাহিত লোকেরা ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত হওয়ার পরও নিজেদের স্ত্রীর সাথে "অবৈধ" সম্পর্ক রক্ষা করে চলছে এ ধরনের অনেক অভিযোগ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য সে সময় অনেকগুলো কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। অবশেষে তাদের সংশোধনের জন্য নিয়ম করে দেয়া হয় যে, তারা উন্মুক্ত স্থানে ঘুমাবে, স্ত্রীদের সাথে কখনো একাকী সাক্ষাত করবে না এবং তাদের সাক্ষাতের সময় কমপক্ষে দুই জন লোক উপস্থিত থাকবে। সেন্ট গ্রেগরী একজন পাদ্রীর প্রশংসা করে লিখছেন যে, সে ৪০ বছর পর্যন্ত তার স্ত্রী থেকে দূরে ছিল এবং মৃত্যুর সময় তার স্ত্রী যখন তার কাছে যায় তখন সে বলে ঃ "নারী, তুই দূর হ।"

চার ঃ এ বৈরাগ্যবাদের সব চাইতে বেদনাদায়ক দিক ছিল এই যে, তা মা-বাপ, ভাইবোন ও সন্তানদের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছিল। খৃষ্টান আওলিয়া দরবেশদের দৃষ্টিতে সন্তানের জন্য মা বাবার স্নেহ-ভালবাসা, ভাইয়ের জন্য ভাই-বোনের স্নেহ-ভালবাসা এবং বাপের জন্য ছেলেমেয়ের ভালবাসাও ছিল একটি পাপ। তাদের মতে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এসব সম্পর্ক ছিন্ন করা অপরিহার্য। খৃষ্টান আওলিয়া দরবেশদের জীবন কথায় এর এমন সব হৃদয় বিদারক কাহিনী দেখা যায় যা পাঠ করে কোন মানুষের পক্ষে ধৈর্যধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। একজন সন্ন্যাসী ইভাগ্রিয়াস (Evagrius) বছরের পর বছর মরুভূমিতে গিয়ে সাধনা করছিল। তার বাবা মা বহু বছর ধরে তার জন্য অস্থিরতা প্রকাশ করছিল। একদিন হঠাৎ তার কাছে তার মা বাবার পত্র পৌছলো। এ পত্র পাঠ করে তার মনে মানবিক ভালবাসার আবেগ উদ্বেলিত হয়ে উঠতে পারে এ আশংকা দেখা দিল। তাই সে ঐ পত্রগুলো না খুলেই আগুনে নিক্ষেপ করলো। সেন্ট থিউডোরাসের মা ও বোন বহুসংখ্যক পাদ্রীর সুপারিশ পত্র নিয়ে যে খানকায় সে অবস্থান করতো সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো এবং পুত্র ও ভাইকে এক নজর দেখার আকাংখা প্রকাশ করলো। কিন্তু সে তাদের সম্মুখে আসতে পর্যন্ত অস্বীকার করলো। সেন্ট মার্কাসের (St. Marcus) মা তার সাথে সাক্ষাতের জন্য তার খানকায় যায় এবং খানকার প্রধানকে অনুনয়-বিনয় করে ছেলেকে মায়ের সামনে আসার নির্দেশ দিতে রাজি করায়। কিন্তু ছেলে কোনক্রমেই মায়ের

www.icsbook.info

সাথে সাক্ষাত করতে চাচ্ছিলো না। শেষ পর্যন্ত সে খানকা প্রধানের নির্দেশ পালন করে এভাবে যে, বেশভূষা পরিবর্তন করে মায়ের সামনে যায় এবং চোখ বন্ধ করে থাকে। এভাবে মাও ছেলেকে চিনতে পারেনি, ছেলেও মায়ের চেহারা দেখতে পায়নি। আরো একজন অলী সেন্ট পোমেন (St. Poemen) ও তার ৬ ভাই মিসরের একটি মরু খানকায় থাকতো। বহু বছর পর তাদের বৃদ্ধা মা তা খোঁজ পায় এবং তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য সেখানে গিয়ে হাজির হয়। ছেলে দূর থেকে মাকে দেখা মাত্রই দৌড়িয়ে গিয়ে তার হুজরায় প্রবেশ করে এবং দরজা বন্ধ করে দেয়। মা বাইরে বসে কাঁদতে থাকলো এবং চিৎকার করে বললো ঃ এই বৃদ্ধাবস্থায় এত দীর্ঘ পথ হেটে আমি কেবল তোমাকে দেখতে এসেছি। আমি যদি তোমার চেহারা দেখি তাহলে তোমার কি ক্ষতি হবে? আমি কি তোমার মা নই? কিন্তু সেসব অলী-দরবেশরা দরজা খুললো না। তারা মাকে বলে দিল যে, আমরা আল্লাহর কাছে তোমার সাথে সাক্ষাত করবো। সেন্ট সিমিউন স্টায়লাইটসের (St. Simeon Stylites) কাহিনী এর চেয়েও বেদনাদায়ক। সে তার মাকে ছেড়ে ২৭ বছর নিরুদ্দেশ থাকে। বাপ তার বিচ্ছেদে মারা যায়। মা জীবিত থাকে। ছেলের আল্লাহর অলী হওয়ার কথা যখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তখন মা ছেলের অবস্থান জানতে পারে। বেচারী মা তার সাথে সাক্ষাতের জন্য তার খানকায় গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু কোন নারীর জন্য সেখানে প্রবেশের অনুমতি ছিল না। ছেলে হয় তাকে ভেতরে ডেকে নিক কিংবা বাইরে এসে তাকে দর্শন দিক এ ব্যাপারে মা অশেষ কাকুতি-মিনতি জানায়। কিন্তু সেই অলী তা করতে সুস্পষ্টভাবে অস্বীকৃতি জানায়। এ অবস্থায় হতভাগিনী মা তিনদিন তিন রাত খানকার দরজার সামনে পড়ে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সেখানেই শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তখন অলী সাহেব বেরিয়ে এসে মায়ের লাশের পাশে অশ্রুপাত এবং তার ক্ষমার জন্য দোয়া করে।

এসব অলীরা তাদের বোন ও সন্তানদের সাথেও এ ধরনের নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছে। এক ব্যক্তি মিউটিয়াসের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন যে, সে ছিল একজন সুখী-স্বচ্ছল মানুষ। হঠাৎ তাকে ধর্মীয় আবেগে পেয়ে বসে এবং সে তার ৮ বছর বয়সের একমাত্র পুত্রকে নিয়ে এক খানকায় গিয়ে হাজির হয়। সেখানে তার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য মন থেকে পুত্রের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা দূর করা একান্ত আবশ্যক ছিল। সেজন্য প্রথমে তাকে পুত্রের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। অতপর তার চোখের সামনে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার সে নিষ্পাপ শিশু সন্তানকে নানাভাবে নির্মম কষ্ট দেয়া হতে থাকে এবং সে তা দেখতে থাকে। এরপর খানকার পুরোহিত তাকে তার ঐ সন্তানকে নিজ হাতে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে নির্দেশ দেয়। সে যখন এ নির্দেশও পালন করতে প্রস্তুত হয় এবং শিশুটিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে উদ্যত হয় ঠিক সে মুহূর্তে সন্ন্যাসীরা এসে তার জীবন রক্ষা করে। এরপরে স্বীকৃতি দেয়া হয় যে, সত্যিই সে অলী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে।

এসব ব্যাপারে খৃষ্টীয় বৈরাগ্যবাদের দৃষ্টিকোণ ছিল এই যে, আল্লাহর ভালবাসা যে ব্যক্তি চায় তাকে মানবীয় ভালবাসার সেসব শৃঙ্খল কেটে ফেলতে হবে যা পৃথিবীতে তাকে তার মা বাবা, ভাইবোন এবং সন্তান-সন্ততির সাথে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করে। সেন্ট জিরুম বলেন ঃ "তোমার ভাতিজা যদি তোমার গলায় বাহু জড়িয়েও থাকে, তোমার মা যদি তোমাকে দুধের দোহাই দিয়ে বিরত রাখতে চায়, তোমাকে বিরত রাখার জন্য

www.icsbook.info

তোমার বাবা যদি তোমার সামনে লুটিয়ে পড়ে, তারপরও তুমি সবাইকে পরিত্যাগ করে এবং বাবার দেহকে পদদলিত করে এক ফোটাও অশ্রুপাত না করে ক্রুশের ঝাণ্ডার দিকে ছুটে যাও। এ ক্ষেত্রে নিষ্ঠুরতাই তাকওয়া।" সেন্ট গ্রেগরী লিখেছেন ঃ "এক যুবক সন্ন্যাসী মন থেকে মা বাবার প্রতি ভালবাসা দূর করতে পারেনি। সে এক রাতে চুপে চুপে তাদের সাথে সাক্ষাত করতে যায়। আল্লাহ তাকে এ অপরাধের সাজা দেন। সে খানকায় ফিরে আসা মাত্রই মারা যায়। তার লাশ দাফন করা হলে মাটি তা গ্রহণ করে না। কবরে বার বার তার লাশ রাখা হয় কিন্তু মাটি তা বাইরে নিক্ষেপ করে। অবশেষে সেন্ট বেনেডিক্ট তার বুকের ওপর তাবারুরুক রাখলে কবর তাকে গ্রহণ করে।" এক সন্ন্যাসিনী সম্পর্কে লিখেছেন যে, সে মারা যাওয়ার পর তিনদিন পর্যন্ত আযাব হতে থাকে। কারণ সে মন থেকে তাঁর মায়ের ভালবাসা দূর করতে পারেনি। একজন অলীর প্রশংসায় লিখেছেন যে, নিজের আত্মীয়-স্বজন ছাড়া সে কখনো অন্য কারো সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করেনি।

পাঁচ ঃ নিজের নিকটাত্মীয়দের সাথে নির্দয়তা, নিষ্ঠুরতা এবং কঠোরতা প্রদর্শনের যে অনুশীলন তারা করতো তাতে তাদের মানবিক আবেগ-অনুভূতি মরে যেতো। এর স্বাভাবিক ফল দাঁড়িয়েছিল এই যে, যাদের সাথে তাদের ধর্মীয় বিরোধ দেখা দিতো এরা তাদের ওপর জুলুম-অত্যাচারের চরম পন্থা গ্রহণ করতো। চতুর্থ শতাব্দীর আগমন পর্যন্ত খৃষ্টবাদের মধ্যে ৮০-৯০টি ফিরকা সৃষ্টি হয়েছিল। সেন্ট অগাষ্টাইন তার সময়ে ৮৮টি ফিরকা গণনা করেছেন। এসব ফিরকা পরস্পরের বিরুদ্ধে চরম ঘৃণা ও হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করতো। হিংসা বিদ্বেষের এ আগুনের ইন্ধন যোগানদাতাও ছিল সন্ন্যাসীরা। এ আগুনে বিরোধী ফিরকাসমূহকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেয়ার প্রচেষ্টায়ও এসব খানকাবাসী সন্ন্যাসীরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতো। এ সাম্প্রদায়িক সংঘাতের একটি বড় আখড়া ছিল আলেকজান্দ্রিয়া। সেখানে প্রথমে এরিয়ান ফিরকার বিশপ আথানাসিউসের দলের ওপর হামলা করে। তার খানকা থেকে কুমারী সন্ন্যাসীনীদের ধরে ধরে বের করে আনা হয়। তাদেরকে উলংগ করে কাঁটাযুক্ত ডাল পালা দিয়ে প্রহার করা হয় এবং শরীরে দাগ লাগানো হয় যাতে তারা নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস বর্জন করে তাওবা করে। এর পর মিসরে ক্যাথলিক গোষ্ঠী বিজয় লাভ করলে এরিয়ান ফিরকার সাথে একই আচরণ করে। এমনকি খুব সম্ভবত খোদ এরিয়াস (Arius)কেও বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। আলেকজান্দ্রিয়াতেই সেন্ট সাইরিল (Cyril) এর মুরীদ সন্ন্যাসীরা ব্যাপক হাংগামার সৃষ্টি করে। এমনকি তারা বিরোধী ফিরকার এক সন্ন্যাসিনীকে ধরে তাদের গীর্জায় নিয়ে হত্যা করে এবং লাশ টুকরো টুকরো করে কেটে আগুনে নিক্ষেপ করে। রোমের পরিস্থিতিও এর থেকে ভিন্ন কিছু ছিল না। ৩৬৬ খৃষ্টাব্দে পোপ লিবেরিয়াস (Liberius) এর মৃত্যু হলে দুই গোষ্ঠীই পোপের পদের জন্য নিজ নিজ প্রার্থী দাঁড় করায়। উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক খুনাখুনি ও রক্তপাত হয়। এমনকি একটি চার্চ থেকে একদিনে ১৩৭টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

ছয় ঃ দুনিয়া বর্জন ও নিসঙ্গ জীবন যাপন এবং কৃচ্ছতা ও দরবেশীর জীবন যাপনের পাশাপাশি পার্থিব ধন-সম্পদ উপার্জনও কম করা হয়নি। পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতেই পরিস্থিতি এ দাঁড়িয়েছিল যে, রোমের বিশপ তার মহলে রাজা-বাদশাহদের মত বসবাস করতো। আর সে যখন সওয়ারীতে আরোহণ করে শহরে বের হতো তখন তার জাঁকজমক

www.icsbook.info

কাইজারের চাইতে কম হতো না। সেন্ট জিরুম তার সময়ে (চতুর্থ শতাব্দীর শেষযুগ) অভিযোগ করেছেন যে, বহু সংখ্যক বিশপের খাওয়ার অনুষ্ঠানসমূহ জাঁকজমকের দিক দিয়ে গভর্ণরদের খাওয়া অনুষ্ঠানসমূহকে লজ্জা দিত। খানকাহ ও গীর্জাসমূহের প্রতি সম্পদের এই প্রবাহ সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভকাল (কুরআন নাযিল হওয়ার যুগ) পর্যন্ত প্লাবনের আকার ধারণ করেছিলো। জনসাধারণের মনে একথা বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছিলো যে, কোন ব্যক্তির দ্বারা কোন বড় গোনাহর কাজ সংঘটিত হলে কোন না কোন অলীর দরগায় নজরানা পেশ করে কিংবা কোন খানকাহ বা চার্চকে ভেট ও উপঢৌকন দিয়েই কেবল ক্ষমা পাওয়া যেতে পারে। যে পার্থিব স্বার্থ ও ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করাই ছিল পাদ্রী–সন্ন্যাসীদের বিশেষ বৈশিষ্ট তা–ই এখন তাদের পদতলে লুটিয়ে পড়লো। যে জিনিস বিশেষ ভাবে এ অধপতনের কারণ হয় তা ছিল সন্ন্যাসীদের অস্বাভাবিক আধ্যাত্মিক সাধনা ও প্রবৃত্তি দমনের চরম প্রচেষ্টা দেখে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে চরম ভক্তি–শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়েছিলো তাতে বহু দুনিয়াদার লোক দরবেশের পোশাক পরে পাদ্রী–সন্ন্যাসীদের দলে অন্তরভুক্ত হয়েছিলো। তারা পার্থিব স্বার্থ বর্জনের মুখোশ পরে দুনিয়া অর্জনের কারবার এমনভাবে জাঁকিয়ে বসেছিল যে, বড় বড় দুনিয়াদারও তাদের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়।

সাত ঃ সতীত্বের ক্ষেত্রেও বৈরাগ্যবাদ প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে বারবার পরাজয় বরণ করেছে আর সে পরাজয়ও বরণ করতে হয়েছে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে। খানকাসমূহে প্রবৃত্তি দমনের এমন কিছু অনুশীলনও ছিল, যে ক্ষেত্রে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা মিলে একই জায়গায় থাকতো এবং কোন কোন সময় কিছুটা কঠিন অনুশীলনের জন্য একই বিছানায় রাত কাটাতো। বিখ্যাত দরবেশ সেন্ট ইভাগ্রিয়াস (Evagrius) অত্যন্ত প্রশংসামুখর হয়ে ফিলিস্তিনের কিছু সংখ্যক সন্ন্যাসী–দরবেশের আত্ম সংযমের উল্লেখ করে বলেছেনঃ "তারা তাদের আবেগ অনুভূতিকে এতটা কাবু করতে সক্ষম হয়েছিল যে, নারীদের সাথে এক জায়গায় গোসল করতো কিন্তু তাদেরকে দেখে, তাদের স্পর্শ পেয়ে এমনকি তাদের সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েও তাদের প্রবৃত্তি সাড়া দিতো না।" বৈরাগ্যবাদের দৃষ্টিতে গোসল যদিও অত্যন্ত অপছন্দনীয় ব্যাপার ছিল। কিন্তু প্রবৃত্তি দমনের উদ্দেশ্যে এ ধরনের গোসলও করা হতো। শেষ পর্যন্ত এ ফিলিস্তিন সম্পর্কেই নাইসার (Nyssa) সেন্ট গ্রেগরী যিনি ৩৯৬ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন—লিখেছেন যে, ফিলিস্তিন অসৎ ও দুশ্চরিত্রের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। যারা মানব–প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে মানব–প্রকৃতি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ক্ষান্ত হয় না। বৈরাগ্যবাদ এর বিরুদ্ধে লড়াই করে অবশেষে লাম্পট্যের যে গহ্বরে পতিত হয়েছে তার কাহিনী খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের ধর্মীয় ইতিহাসের একটি কুৎসিত কলঙ্ক। দশম শতাব্দীর একজন ইতালীয় বিশপ লিখছেন ঃ চার্চে ধর্মীয় দায়িত্ব পালনকারীদের বিরুদ্ধে যদি লাম্পট্য ও চরিত্রহীনতার শাস্তিমূলক আইন কার্যকর করা হয় তাহলে চার্চের কাজে নিয়োজিত লোকদের মধ্যে কেবল বালকরা ছাড়া আর কেউ তা থেকে রক্ষা পাবে না। আর যদি অবৈধ সন্তানদেরকেও ধর্মীয় কাজের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার নিয়ম চালু করা হয় তাহলে হয়তো চার্চের কাজে নিয়োজিত কোন বালকই সেখানে থাকতে পারবে না। মধ্য যুগের লেখকদের গ্রন্থসমূহ এ ধরনের অভিযোগ ও কাহিনীতে ভরা যে, সন্ন্যাসিনীদের খানকাসমূহ চরিত্রহীনতার আখড়া তথা বেশ্যালয়ে পরিণত হয়েছে, চতুর্দেয়ালের মধ্যে

www.icsbook.info

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ
رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٨﴾
لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ
الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রসূল (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর ঈমান আনো।[৫৫] তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে দ্বিগুণ রহমত দান করবেন, তোমাদেরকে সেই জ্যোতি দান করবেন যার সাহায্যে তোমরা পথ চলবে[৫৬] এবং তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করে দেবেন।[৫৭] আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (তোমাদের এ নীতি অবলম্বন করা উচিত) যাতে কিতাবধারীরা জানতে পারে যে, আল্লাহর অনুগ্রহের ওপর তাদের একচেটিয়া অধিকার নেই, বরং আল্লাহর অনুগ্রহ নিরংকুশভাবে আল্লাহরই হাতে নিবদ্ধ। তিনি যাকে চান তা দেন। তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল।

নবজাতক শিশুদের গণহত্যা চলছে, পাদ্রী এবং চার্চের ধর্মীয় কাজ সম্পাদনকারী কর্মীদের মধ্যে "মুহরেম" বা যেসব নারীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম তাদের সাথে পর্যন্ত অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন ও খানকাসমূহে সমকামিতার অপরাধ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে এবং গীর্জাসমূহে পাপ স্বীকারের (Confession) অনুষ্ঠান দুষ্কর্ম ও চরিত্রহীনতার সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কুরআন মজীদ এখানে বৈরাগ্যবাদরূপী বিদআত আবিষ্কার করা এবং পরে তা যথার্থভাবে মেনে চলতে না পারার কথা বলে খৃষ্টান ধর্মের কোন্ বিকৃতির প্রতি ইংগিত করছে বিস্তারিত এসব বর্ণনা থেকে তা সঠিকভাবে অনুমান করা যেতে পারে।

৫৫. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল মুফাসসির বলেনঃ এখানে يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا কথাটি দ্বারা যারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর ঈমান এনেছিলো তাদের সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের বলা হচ্ছে, এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনো। এজন্য তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেয়া হবে। একটি পুরস্কার দেয়া হবে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর ঈমান আনার জন্য এবং আরেকটি পুরস্কার দেয়া হবে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনার জন্য। অপর দল বলেন, যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান এনেছে এখানে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের বলা হচ্ছে, তোমরা শুধু মৌখিকভাবে তার নবুওয়াতকে স্বীকার করেই ক্ষান্ত হয়ো না, বরং সরল মনে নিষ্ঠার সাথে ঈমান গ্রহণ করো এবং ঈমান গ্রহণের হক

www.icsbook.info

আদায় করো। এভাবে তোমরা দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে। একটি পুরস্কার কুফরী ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণের জন্য এবং আরেকটি পুরস্কার নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা সহ ইসলামের খেদমত করার ও তার ওপর দৃঢ়পদ থাকার জন্য। সূরা কাসাসের ৫২ থেকে ৫৪ পর্যন্ত আয়াত প্রথম তাফসীরের সমর্থন করে। তাছাড়া হযরত আবু মূসা আশআরী বর্ণিত হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। হাদীসটিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তিন ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। উক্ত তিন ব্যক্তির মধ্যে একজন হচ্ছে

رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمَنَ بِنَبِيِّهٖ وَ اٰمَنَ بِمُحَمَّدٍ

"আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে সে ব্যক্তি যে পূর্ববর্তী নবীর প্রতি ঈমান পোষণ করতো এবং পরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর ওপর ঈমান এনেছে।" (বুখারী ও মুসলিম)।

সূরা সাবার ৩৭ আয়াত দ্বিতীয় তাফসীরের সমর্থন করে যাতে বলা হয়েছে; সৎকর্মশীল ঈমানদারদের জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। দলীল–প্রমাণের দিক দিয়ে দু'টি তাফসীরই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পরবর্তী বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে বুঝা যায় যে, এখানে দ্বিতীয় তাফসীরটিই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এ সূরার বিষয়বস্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এ তাফসীরকেই সমর্থন করে। যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতকে স্বীকার করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো এ সূরার শুরু থেকে সেসব লোককেই সম্বোধন করা হয়েছে। গোটা সূরায় তাদেরকেই সম্বোধন করে এ আহবান জানানো হয়েছে যে, তারা যেন শুধু মৌখিকভাবে স্বীকৃতি দান করে ঈমানদার না হয়, বরং নিষ্ঠার সাথে সরল মনে ঈমান গ্রহণ করে।

৫৬. অর্থাৎ পৃথিবীতে জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির এমন 'নূর' দান করবেন যার আলোতে তোমরা প্রতি পদক্ষেপে স্পষ্ট দেখতে পাবে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের বাঁকা পথ–সমূহের মধ্যে ইসলামের সরল সোজা পথ কোন্‌টি। আর আখেরাতে এমন 'নূর' দান করবেন যার উল্লেখ ১২ আয়াতে পূর্বেই করা হয়েছে।

৫৭. অর্থাৎ ঈমানের দাবী পূরণের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মানবিক দূর্বলতার কারণে তোমাদের দ্বারা যে ভুল ত্রুটিই সংঘটিত হোক না কেন তিনি তা ক্ষমা করে দেবেন। আর ঈমান গ্রহণের পূর্বে জাহেলিয়াতের সময় তোমাদের দ্বারা যেসব ভুল–ত্রুটি সংঘটিত হয়েছে তাও ক্ষমা করে দেবেন।

---

www.icsbook.info